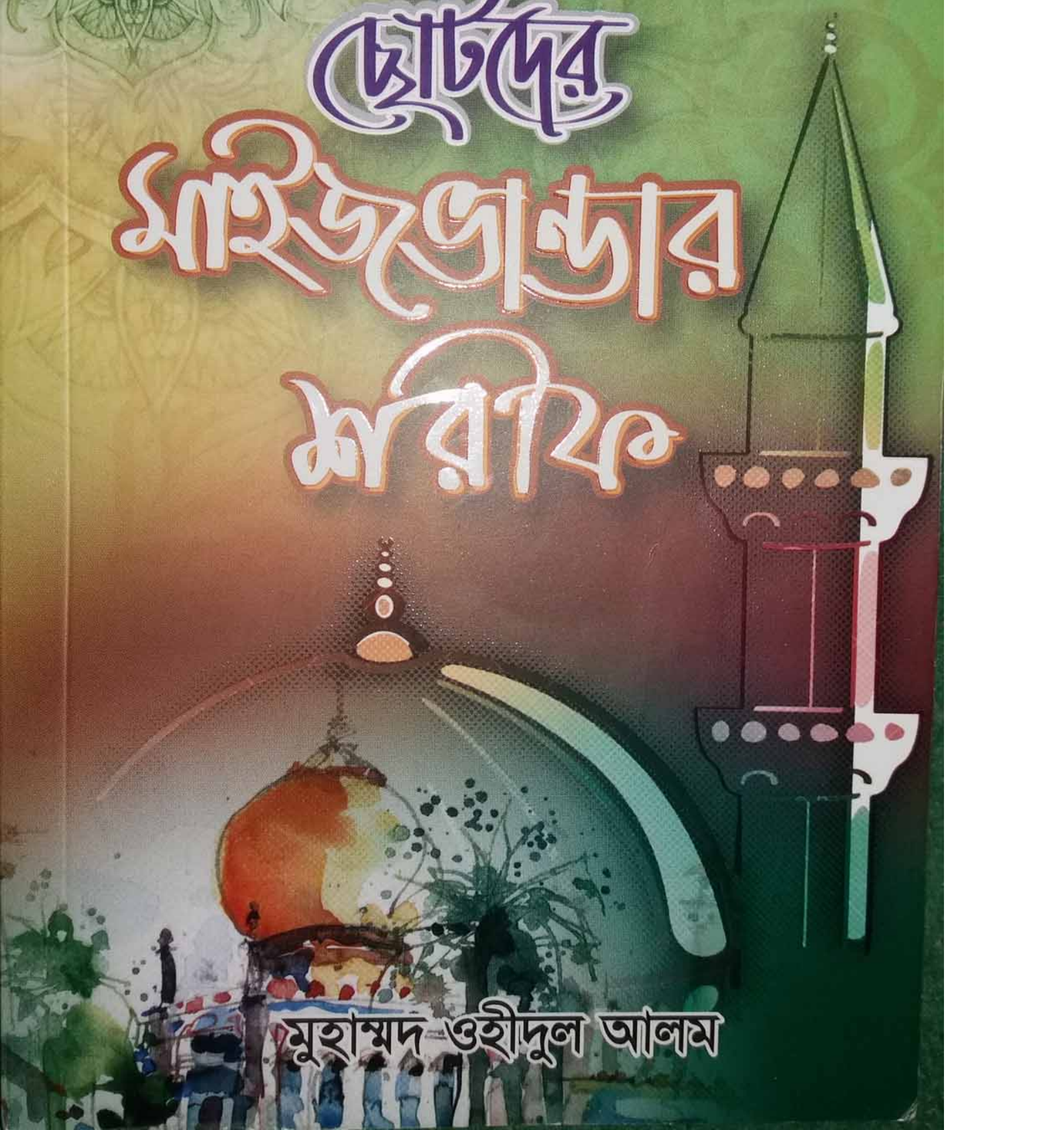


ছোটদের
মাহিঙ্গলজাভার
জরররর



মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

চৌদ্দশের মহিউজজোদার জব্বারি

মুহাম্মদ ওহীদুল আনাম

ছেটিদের মাইজভাণ্ডার শরীফ

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
ট্রাস্ট-এর প্রকাশনা শাখা আলোকধারা বুকস-এর পক্ষে-

প্রকাশক

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

প্রধান উপদেষ্টা

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি

গাউসিয়া হক মন্ডল

মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

ডাক- ভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৩৫২

লেখক

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

প্রথম প্রকাশ :

নবম শতাব্দীর সমাবেশ

১৫ জানুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ:

লাইভ কালার

মুদ্রণ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স

গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরীফ

সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ্ রোড

বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম - ৪২১১

মূল্য: ৫০ টাকা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৪
হযরত সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ (কঃ)	০৬
হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)	১৮
হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ..	২৫
হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)	২৭
হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)	৩২
ছবিতে মাইজভাণ্ডার শরীফ	৪০

তোমরা নিশ্চয়ই মাইজভাণ্ডার শরীফের নাম শুনেছ। মাইজভাণ্ডার একটি গ্রামের নাম। এটা চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানায় অবস্থিত। এ গ্রামের নামের সাথে শরীফ যোগ হওয়াতে এটা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। শরীফ অর্থ হচ্ছে সম্মানিত। এ এমটি সম্মানিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে আল্লাহর একজন মহান অলি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অলি অর্থ বন্ধু। আল্লাহ সবার চেয়ে মহান। যারা তাঁর বন্ধু তাঁরা খুবই সম্মানিত। আল্লাহর বন্ধু হতে পারা সহজ ব্যাপার নয়।

মাইজভাণ্ডার গ্রামে জন্ম নেয়া যে মহান অলির কথা আমরা বলছি তাঁর নাম হচ্ছে সৈয়দ আহমদ উল্লাহ। আমরা সম্মান করে তাঁর নামের পূর্বে হযরত ও পরে ‘কাদাছালাহু ছিররাহুল আজিজ’ বলি। এটাকে সংক্ষেপে (কঃ) লেখা হয়। ‘কাদাছালাহু ছিররাহুল আজিজ’ হচ্ছে বুজুর্গ ব্যক্তিদের উপাধি। এটা এক প্রকার দোয়া। এর অর্থ ‘আল্লাহ তাঁর রহস্য পবিত্র করুন’।

এ সুযোগে তোমরা আরো করেকটি কথা জেনে নাও। নবীদের নামের শুরুতে হযরত এবং শেষে ‘আলাইহিস সালাম’ বলতে হয়। ‘হযরত’ অর্থ জনাব ও ‘আলাইহিস সালাম’ অর্থ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটাকে সংক্ষেপে (আ.) লিখা হয়। পৃথিবীতে অনেক নবী এসেছেন। তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই জানেন। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় মত হচ্ছে তাঁদের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার। আবার সাহাবাদের নামের শেষে রাখিয়ালাহু আনহু বলতে হয়। লিখার সময় সংক্ষেপে (রা.) লিখা হয়। এর অর্থ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিতাবস্থায় দেখে তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন ও আন্তরিকভাবে ভালোবেসেছেন তাঁরাই সাহাবী। সাহাবীদের মর্যাদা অলিদের চাইতেও বেশি।

যাহোক, তোমরা জন মুসলমান শিশুদের অর্ধবহ নাম রাখতে হয়। আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। আল্লাহর নামের সাথে মিলিয়ে আল্লাহর বান্দাদের নাম রাখতে হয়। আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর নাম আল্লাহর নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর নাম

মিলিয়ে রাখা হয়েছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে একটি দরদ। এর মাধ্যমে রাসূল করীম এর জন্য শান্তি ও মর্যাদা কামনা করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ‘আহমদ’ হচ্ছে আমাদের রাসূলের অন্যতম নাম। এর অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী। সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মানে আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী।

তিনি তৎকালীন মানুষদের মাঝে আল্লাহর পরিচয় নূতনভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও চেষ্টার ফলে অনেক মানুষ আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতে শিখেছে। তারা খারাপ পথ ছেড়ে দিয়ে সং পথে এসেছে। মন্দ কাজ ছেড়ে ভালকাজ করতে শিখেছে। মানুষকে যুগা না করে ভালোবাসতে শিখেছে। মানুষকে কষ্ট না দিয়ে সেবা করতে শিখেছে। বাজে পথে টাকা পরসাদা খরচ না করে সংপথে ও সংকাজে টাকা খরচ করতে শিখেছে। তারা অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করেনি। পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করেছে। তারা কোনটা হালাল, কোনটা হারাম তা চিনতে শিখেছে। যারা ভুলের মধ্যে ছিল তারা স্তব্ধ হতে শিখেছে। তোমরা যখন বড় হয়ে তাঁর পুরো জীবনী পাঠ করবে তখন অনেক কিছু জানতে পারবে।

এ ছোট বইটি তোমাদের জন্য লেখা হয়েছে। এখানে হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ছাড়াও তাঁর উত্তরাধিকারী হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ), হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (কঃ), হযরত সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (কঃ), হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) এর কথাও আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা সবাই ছিলেন আল্লাহর খাস বান্দা-আল্লাহর অলি। তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারলে তোমরা মাইজভাণ্ডার শরীফের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে বুঝতে পারবে। তাঁরা সহ আরো অনেকের চেষ্টা ও সাধনায় মাইজভাণ্ডার শরীফের গৌরব ও সম্মান দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আশা করি তাঁদের জীবনী পাঠ করে তোমরাও সুন্দর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে।

হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)

তাকে বলা হয় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। কারণ মানুষ নামের চাইতেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুণে বেশি পরিচিত হয়।

গাউসুল আযম মানে মহান সাহায্যকারী। তিনি যে কোন মানুষকে বিপদে আপদে উদ্ধৃত্ত সাহায্য করতে পারতেন। তাঁর এ শক্তি আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতামালী। তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে ‘কুন’ বললেই তা হয়ে যায়। ‘কুন’ মানে হও। আল্লাহর অলিরা আল্লাহর গুণে গুণায়িত। তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পায়।

অলিদের এ শক্তিকে বেলায়তি শক্তি বলা হয়। এ শক্তির যখন প্রকাশ ঘটে মানুষ তা সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। মনে করো, তোমরা যখন দেখ যে, পানি নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে তোমরা সহজেই বুঝতে পার যে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ পানি উপরের দিক থেকে নীচের দিকেই গড়ায়। আবার দেখা যায় যে, কোন কিছুতে আগুন লাগলে তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এটাই স্বাভাবিক। কারণ আগুনের কাজই হল কোন কিছুকে পুড়িয়ে ফেলা। যেমন পানির কাজ ভিজিয়ে দেয়া।

এখন ধর, আল্লাহর কোন বিশিষ্ট বান্দা বৃষ্টির ভেতর হেঁটে যাচ্ছেন অথচ তাঁর কাপড় চোপড় রয়ে গেছে খটখটে শুকনো, অথবা হাতে জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে ঘুরছেন অথচ তাঁর হাত পুড়েছে না- এসব অতি আশ্চর্য ঘটনাই বটে। তোমরা যখন বড় হয়ে বিভিন্ন অলি আল্লাহদের জীবনী পড়বে তখন কারো কারো বা অনেকেই জীবনে এ রকম অত্যশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখবে। এ গুলোই হচ্ছে বেলায়তি শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলোকে অলিদের ‘কারামত’ বলা হয়। তবে এগুলো জাদুকরদের ভোজবাজি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা

কাবা (কঃ) তেমন অলিদের মধ্যে এমন উচ্চস্তরের একজন অলি যিনি যে কোন সাধারণ মানুষকেও আল্লাহর অলি বানিয়ে দিতে পারতেন। এ জন্য তাঁর ‘লকব’ বা উপাধিও হয়েছে অতি উঁচু স্তরের- গাউসুল আযম। তোমরা সম্ভবত আরেকজন গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর নাম শুনেছ। তোমরা ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছ, এ দু’জন মহান অলির মধ্যে গভীর যোগসূত্র রয়েছে।

সংক্ষেপে তোমাদের কাছে সে যোগসূত্র টুকুর কথা উল্লেখ করছি। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গাউসে আজমিয়তের দু’টি মহা সম্মানিত বেলায়তি ‘তাজ’ বা মুকুট ছিল। তিনি তাঁর একটি তাজ গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর মাথা মোবারকে ও অপর তাজটি গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর মাথা মোবারকে স্থাপন করেন। গাউসুল আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ), যিনি আমাদের দেশে ‘বড়পীর’ নামে সর্বাধিক পরিচিত, তিনি আজ থেকে প্রায় সাড়ে নয়শত বছর পূর্বে ইরাকের বাগদাদ শহরে জিলান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে ১৯০ বছর পূর্বে বাংলাদেশের মাইজভাণ্ডার গ্রামে। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে ‘হযরত সাহেব কেবলা’-ও বলা হয়।

জন্ম

তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৩৩ সনের ১ মাঘ, রোজ বুধবার, দুপুরের পর জোহরের নামাযের সময়। তখন ছিল ১২৪৪ হিজরি, ১৮২৬ ইংরেজি ও ১৮৮৮ ময়ীসন।

বংশ পরিচিতি

হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ ও মাতার নাম সৈয়দা বিবি খায়রুন্নেছা।

তোমরা জন সৈয়দ বংশের ধারা আমাদের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বংশধারার সাথে সম্পর্কিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর মাধ্যমে তাঁর বংশধারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এ দু'ধারার মিলন ঘটে বাগদাদে পূর্ব বর্ণিত গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর জীবনে। তাঁর মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধারা এশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধারার লোকজন সাধারণত ইসলাম প্রচার ও প্রসার কাজে জড়িত থাকতেন। কোথাও কোথাও তাঁরা ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। কখনো কখনো বিচারক হিসেবেও কাজ করতেন। তখনকার দিনে বিচারকদের 'কাজী' বলা হত। যেহেতু তাঁরা ছিলেন ইসলাম ধর্ম তথা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানসম্পন্ন। সর্বোপরি তাঁরা ছিলেন খুবই ন্যায়পরায়ণ। তাই যারা দেশ শাসন করতেন তাঁরা এঁদেরকে কাজীর দায়িত্ব দিতেন।

তেমনি একজন ব্যক্তি একসময় গৌড় নামক স্থানে ইমাম ও কাজী নিযুক্ত হন। তখন গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। বাংলার শাসকদের তখন বলা হত নবাব। বাংলার নবাবরা ছিলেন মুসলমান। তাঁরাই সৈয়দ বংশের উপযুক্ত লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেদের রাজ্যে নিয়ে আসতেন। গৌড়ে যিনি ইমাম ও কাজী নিযুক্ত হন তাঁর নাম ছিল সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী। একবার গৌড়ে ভীষণ মহামারি দেখা দেয়। তোমরা 'মহামারি' অর্থ বুঝতো? যখন কোন রোগ ব্যাপক হারে লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে রোগকে বলে মহামারি। তখন ১৫৭৫ সাল। সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী সে সময় চট্টগ্রাম চলে আসেন। চট্টগ্রাম এসে তিনি পটিয়া থানার অন্তর্গত

কাঞ্চন নগর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখানে এসে তিনি স্থানীয় লোকদের ইসলামের বিধি বিধান শিক্ষা দেন। এসব কাজকে দাওয়াতি কাজ বলা হয়। এখানে তিনি ইমামতির কাজও করেন। এগুলো ছিল খুবই সম্মানজনক কাজ। তিনি মানুষের এত বেশি সম্মান লাভ করেছিলেন যে, তাঁর নামে গ্রামের নামই হয়ে পড়ে হামিদগাঁও। বর্তমানে এ গ্রামটি হাইদগাঁও নামে পরিচিত। পটিয়া থানা হাট থেকে উত্তর দিকে ২ কিলোমিটার দূরে গেলেই তোমরা হাইদগাঁও গ্রামে পৌঁছে যেতে পার। এই হামিদ সাহেবের এক পুত্রের নাম সৈয়দ আবদুল কাদের (রঃ)। তিনি হামিদগাঁও থেকে ফটিকছড়ি থানার আজিম নগরে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি ইমামতির দায়িত্ব নেন। তাঁর পুত্র ছিলেন সৈয়দ আতাউল্লাহ। আতাউল্লাহর পুত্র ছিলেন সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ। তাঁর ছিল তিন সন্তান। মেজ সন্তানের নাম ছিল মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ। তিনি আজিম নগর থেকে মাইজভাণ্ডার গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন খুবই পরহেজগার, দ্বীনদার ও মুতাকী আলেম। মুতাকী মানে যিনি সবসময়, সব কথায় ও কাজে আল্লাহকে স্মরণ ও ভয় করে চলেন। সবাই তাঁকে খুব সম্মান ও ভক্তি করত। তিনিই ছিলেন গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পিতা।

শৈশব

শিশু হযরত মা বাবার আদর স্নেহে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন। মুসলিম শিশুর চার বছর চার মাস বয়স হলে লেখাপড়ার প্রথম পাঠ দেয়ার নিয়ম, উক্ত বয়সে উপনীত হলে তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করা হয়। শুরু থেকেই লেখা পড়ায় তিনি ছিলেন মনোযোগী। প্রতিদিন ঠিক সময়েই তিনি মক্তবে যেতেন। একা একাই যেতেন আবার একা একাই ফিরতেন। শিক্ষকদের কথা মত চলতেন। সহপাঠীদের সাথে ছিল খুবই মিলমিশ। হৈ চৈ পছন্দ করতেন না। কারো সাথে করতেন না কোন ঝগড়াঝাটি। আসা যাওয়ার পথে গ্রামের সবুজ গাছপালা নদী নালার সৌন্দর্য, পাখির কিচির মিচির তাঁকে বেশ আনন্দ দিত। সাত বছর বয়সে তিনি নামায পড়া

শিখেন। এ ছিল তাঁর এক নতুন আনন্দের সময়। আমাদের সবার ও সবকিছুর একজন আল্লাহ আছেন। তাঁকে আমরা দেখিনা, তিনি আমাদের দেখেন। তাঁকে সিজদা দেয়ার মধ্যে কতই না আনন্দ, তোমরা একবার আল্লাহকে সিজদা দিয়ে দেখ। দেখবে তোমাদের মন কিভাবে আনন্দে ভরে গেছে। যাহোক, মা-বাবা, প্রতিবেশী, শিক্ষক সবাই তাঁকে নিয়ে খুশি। যেমন তাঁর মেধা, তেমন তাঁর অমায়িক আচার আচরণ।

দূরদেশে

তাঁর গ্রামের লেখাপড়া শেষ হলে তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দূরদেশে পাঠানোর চিন্তা শুরু হয়। তখন দেশে উচ্চ শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন ছিল পরাধীন যুগ। দেশ ছিল বৃটিশদের অধীনে, লেখাপড়ায় মুসলমানরা ছিল খুবই পিছিয়ে। বেশির ভাগ মানুষ ছিল গরীব। তথাপি তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠানো হয়। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এখন একে বলা হয় কোলকাতা। তিনি ১২৬০ হিজরিতে কোলকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি এ মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি শুরু থেকেই আল্লাহ-ভীরু ছিলেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। সবসময় জামাতের সাথে নামায আদায় করতেন। নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলওয়াত করতেন। অজিফা পাঠ করতেন নিয়মিত। নফল নামাজ পড়া ও নফল রোজা রাখা ছিল তাঁর একান্ত অভ্যাস। রাত জেগে তাহাজ্জুদ, সালাতুত তসবিহ ও অন্যান্য নামায আদায় করতেন। তাহাজ্জুদ ও সালাতুত তসবিহ-র নামায সম্পর্কে তোমরা আবু আম্মু অথবা বড়দের কাছ থেকে জেনে নিবে। সবসময় তিনি অজু অবস্থায় থাকতেন। কখনো গভীর ঘুমো রাত পার করতেন না। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। পাঠ্য পুস্তকের কঠিন বিষয়গুলো সহজে ও কম সময়ের মধ্যে শিখে ফেলতে পারতেন। তিনি অলস ছিলেন না। তাই ইবাদত বন্দেগী ও লেখাপড়ার জন্য কখনো তাঁর সময়ের অভাব হতনা। ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ বেশি

থাকায় তাঁর মাঝে সবসময় পবিত্রতার একটা প্রভা জ্বলমল করত। নীরবতা পছন্দ করতেন। মৃদু হাসি ও মধুর স্বভাব ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অটুহাসিতে ফেটে পড়তে ও অযথা বাজে গল্পে গুজবে মেতে থাকতে তাঁকে দেখিনি কেউ। তাঁর ছিল একটি চিন্তাশীল মন। নির্জন অবস্থায় নীরবে বসে নানা চিন্তায় বিভোর থাকতেন। তিনি নদীতীরে বেড়াতে ভালবাসতেন।

পেশাগত জীবন

শিক্ষা জীবন শেষে তিনি যশোরে কাজী পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেটা ছিল সরকারি পদ। অর্থ ও সম্মান দু'টোই সেখানে ছিল। কিন্তু তিনি খেচরায় এ লোভনীয় পদ ছেড়ে দেন। পরে কোলকাতা মুন্সীবো-আলী মাদরাসায় প্রধান মোদাররিসের পদে যোগ দেন। জেনে রাখ, মোদাররিস মানে শিক্ষক। তখন ছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ।

আধ্যাত্মিক জীবন

তিনি ছিলেন শরীয়তের একনিষ্ঠ অনুসারী। শরীয়তের আলো তাঁকে অধিকতর আলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়। একজন কামিল আলির সংস্পর্শে এসে তিনি আধ্যাত্মিকতার রহস্যময় ভূবনে প্রবেশ করেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ আল কাদেরী লাহোরী (রঃ) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হযরত সৈয়দ আবু শাহমার বড় ভাই সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (রঃ) এর খেদমতে গিয়ে অশেষ ফয়েজ ও রহমত লাভ করেন। উনারা দু'দুজনই ছিলেন হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর বংশধর। এভাবে তিনি উপযুক্ত পীরের উপযুক্ত শিষ্য হবার গৌরব লাভ করেন। তিনি হন দ্বিতীয় গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

কারামত

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কোন ঘটনা সংঘটিত হলে তাকে আমরা অলৌকিক ঘটনা বলি। অলি আল্লাহদের জীবনে সংঘটিত এ রকম ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাকে আমরা কারামাত বলি। আউলিয়াদের

কারামত সত্য। আসলে কারামত হল আত্মাহর কুদরতী শক্তির বহিঃপ্রকাশ যা আউলিয়ারদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর জীবনে অসংখ্য কারামত সংঘটিত হয়েছে। তন্মধ্যে বাড়ির পুকুরে অজুর বদনা নিক্ষেপ করে বাঘের আক্রমণ থেকে ৪২ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়ার কোদালা পাহাড়ে একজন ভক্তের উদ্ধারের কাহিনী বিখ্যাত হয়ে আছে। লাঠির প্রহারে স্থানীয় ধুরং খালের গতি পরিবর্তন তাঁর আরেকটি কারামত। লাঠির আঘাতে মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণ সঞ্চারের মত আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছেও তাঁর হাতে। বিপদগ্রস্ত সহায় সম্বলহীন হজ্ব যাত্রীকে সুদূর মুক্কা শরীফ থেকে নিমিষের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরে প্রেরণ তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির এক বড় পরিচয়।

এবার এ মহান অলির কয়েকটি কারামাতের ঘটনা একটু বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে বলছি।

ক. বদনা নিক্ষেপে বাঘের কবল হতে ভক্তের উদ্ধার:

আনুমানিক ১৮৯৫ সাল হতে ১৯০০ ইং এর মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা।

হযরত সাহেব কেবলা (কঃ) আছরের নামাযের অজু করার জন্য নিজ পুকুর ঘাটে বসা ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল অজুর বদনা। হঠাৎ তিনি, “হারামজাদা, তুই এখনো দূর হস নাই?” বলে বদনাটি সজোরে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করেন।

আশে পাশে উপস্থিত ভক্তরা হযরতের এহেন আচরণের রহস্য ভেদ করতে না পেরে অবাক হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি অন্য একটি বদনা তাঁকে এনে দেয়া হয়। তিনি সে বদনা দিয়ে যথারীতি অজুর কাজ সারেন। ছুঁড়ে দেয়া বদনাটি খোঁজার জন্য ভক্তদের কয়েকজন পুকুরের পানিতে নামেন। কিন্তু বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরও বদনাটি পাওয়া গেলনা।

এদিকে মাইজভাণ্ডার শরীফ হতে ৪২ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়ার (বর্তমানে উপজেলা) কোদালা পাহাড়ের বনপথে (রাইখালি ইউনিয়ন) অন্য একটি ঘটনা ঘটেছিল। আছমত আলী নামে একজন

গরীব মানুষ হযরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি কাঠ কাটার জন্য বনে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ঐ কাঠ বিক্রি করে কিছু টাকাপয়সা পেলে তা দিয়ে হজুর কেবলা (ক.) এর জন্য কিছু নাস্তা তৈরি করে মাইজভাণ্ডার শরীফ যাবেন। কিন্তু কাঠ নিয়ে ফেরার পথে একটি বাঘ তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আছমত আলী বাঘের ভয়ে ভীত হয়ে ভাবেন আজ তাঁর নিশ্চিত মরণ হবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে: ইয়া গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।

এ কথা উচ্চারণের সাথে সাথে হঠাৎ দেখেন একটা বদনা উড়ে এসে সজোর বাঘের মাথায় আঘাত করছে। উদ্ভূত বদনার আঘাতে বাঘ গেল পালিয়ে। আছমত আলী হতভম্ব, বিস্মিত। মুখে তার কোন কথা নেই। দেখেন বদনাটি পড়ে আছে সামনে। দেখেই চিনতে পারেন বদনাটি। এতো হযরত কেবলা সাহেব (কঃ) এর বদনা!

সেই থেকে এ জায়গাটির নাম হয়ে পড়ে বাঘমারা ঘোনা। বর্তমানে এ বাঘমারা ঘোনা নামটি “আলতাফ ড্রাইভার ঘর” নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

উক্ত ঘটনার তিনদিন পর আছমত আলী বদনা ও কিছু নাস্তাপানি নিয়ে হযরত কেবলা (কঃ) এর দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর হাতে বদনা ও ঘটনার বিবরণ শুনে সবাই তো হতবাক!

তোমরাও কি অবাক হচ্ছে?

আসলে আত্মাহর অলিদের কারামত যুগে যুগে মানুষকে এভাবেই হতভম্ব করেছে।

খ. ধুরঙ্গ খালের গতি পরিবর্তন:

ধুরঙ্গ খাল একটি খরস্রোতা নদী। হযরত কেবলা সাহেব (কঃ) একদিন কিছু লোকজনসহ নাজিরহাট যাচ্ছিলেন। নদী পার হতে গিয়ে তাঁর পা মোবারক পিছলে যায় ও তাঁর পরনের কাপড়ও কিছুটা ভিজে যায়। তিনি এক পর্যায়ে লাঠি দিয়ে খালের পানিতে প্রহার করতে থাকেন। তিনি বলেন: “এ খালটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বেয়াদবি করেছে।” পরবর্তীতে এ খালের গতি পরিবর্তিত হয়ে মূল খালটি পুরোপুরি ভরাট হয়ে যায়।

গ. একজন অসহায় হাজীকে নিজ শহর চট্টগ্রামে প্রেরণ:

চট্টগ্রাম নিবাসী একজন মানুষ [তিনি তাঁর নাম পরিচয় গোপন রেখেছেন] মক্কা শরীফ হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। টাকা পরিসা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁর বাড়ি ফেরার কোন উপায় ছিলনা। আরবী ভাষাও জানেন না তিনি। ফলে তাঁর বিপদের কথা কাউকে জানাতেও পারছিলেন না। তাই জীবন বাঁচানোর জন্য বোবার মত ভিক্ষা করতে থাকেন তিনি। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিপদ মুক্তির জন্য অনেক কান্নাকাটি করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁর সাথে সেখানে হযরত সাহেব কেবলা (কঃ) এর আচানক সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে নিজের দুরবস্থার কথা খুলে বলেন। সেদিন একত্রে মাগরিব নামায পড়ে হযরত সাহেব কেবলা (কঃ) একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁর হাতে দেন এবং বলেন, আপনি সামানের দিকে তাকান। তিনি সামানে তাকিয়ে একটা উজ্জ্বল বাতি জ্বলতে দেখেন। হযরত সাহেব কেবলা (কঃ) লোকটিকে সে আলোর দিকে অগ্রসর হতে বলেন। তিনি তাঁকে একটি 'ইছম'ও শিখিয়ে দেন। এক সময় তাঁর সামনের আলোটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তিনি 'ইছম'টিও ভুলে যান।

তিনি দেখেন সকাল হয়ে গেছে এবং তিনি চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দাঁড়িয়ে আছেন।

তোমরা বড় হলে যখন তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী পাঠ করবে তখন আরো অনেক আশ্চর্য সত্য কাহিনী জানতে পারবে।

তাঁর আরেকটি জীবন্ত কারামত হচ্ছে রুহানী ফরয়েজ বিতরণের মাধ্যমে অসংখ্য আউলিয়ার সৃষ্টি। আল্লাহ তাঁকে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেছিলেন যা ব্যবহার করে তিনি অনেক মানুষকে আল্লাহর আলিতে পরিণত করে দিয়েছেন। এবার তোমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় তাঁর আওলাদে পাকের তালিকা দেখ।

তাঁর সংক্ষিপ্ত আওলাদে পাক পরিচিতি

মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র (১৮২৬-১৯০৬) পুত্রবারার বংশ লাতিকা

সৈয়দ ফয়জুল হক (১৮৬৫-১৯০২)

অর্থাৎ গাউসুল আযম শাহসুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩-১৯৮২)

সৈয়দ জিয়াউল হক	-	সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (১৯৬৯)
(১৯২৮-১৯৮৮)		
সৈয়দ মুনিরুল হক	(১৯৩২-২০০৬)	
সৈয়দ এমাদুল হক	(১৯৩৬)	
সৈয়দ দিদারুল হক	(১৯৪৫)	
সৈয়দ সাহিদুল হক	(১৯৫২)	

তাঁর খলিফাগণঃ

এছাড়া তাঁর অসংখ্য খলিফা রয়েছেন। 'খলিফা' মানে প্রতিনিধি অথবা যিনি পেছন পেছন আসেন। এ সকল খলিফা তাঁর সামাজিক ও রুহানী শিক্ষার ফসল। এসব খলিফা ছিলেন তাঁর ক্ষমতা, মর্যাদা ও মহিমার প্রকাশ। যারা এক সময় ছিলেন সাধারণ মানুষের কাতারে তাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসে এক একজন অসাধারণ ও সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের জীবনধারা গেছে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে। তাঁরা স্ব স্ব পরিবার পরিজন, এলাকাবাসী ও সাধারণ মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁদের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ধারাপ পথ থেকে ভালো পথে ফিরে এসেছে। তারা অপর মানুষকে

ভালোবাসতে শিখেছে। অন্যায় থেকে বিরত থেকেছে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে ও অনুসরণ করতে শিখেছে। খলিফাগণ নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে ও অসহায়, বঞ্চিত, গরিব মানুষদের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন।

তারা প্রত্যেকেই মাইজভাণ্ডারী বাগানের এক একটি সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল। মানুষ এখনোও তাঁদের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ অনুভব ও উপভোগ করে।

বড় হয়ে তোমরা যখন হযরত সাহেব কেবলা (ক.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী পড়বে তখন তোমরা তাঁদের নাম ও পরিচয় জানতে পারবে।

তাঁর কিছু অমর বাণী

হযরতের এক একটি কালাম তাঁর কারামতের মতই প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষের জীবনে। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের উপাদানও তাতে অন্তর্নিহিত রয়েছে।

১। “আমি একদিন আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের সাথে কাবা শরীফে টুকে দেখতে পেলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয় (সিনা) মোবারক এক অসীম দরিয়া (সাগর)। আমরা উভয়ে এতে ডুব দিলাম।”

২। “নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দু’টি টুপি ছিল। তিনি একটি আমার মাথায় এবং অপরটি হযরত পীরানে পীর সাহেব (রঃ)-এর মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন।”

৩। “আমার চার কুরসী, চার ইমাম আছে, বারটি বুজ বা সিভারা আছে, বারটি কাছারি আছে।”

৪। “হাসরের দিনে আমিই প্রথম বলব, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু।”

৫। “ফেরেশতার কালের বনে যাও” অর্থাৎ ফেরেশতার মত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আল্লাহর প্রাঙ্গণসায় রত থাক।”

ছোটদের মাইজভাণ্ডার শরীফ -১৬

৬। “কবুতরের মত বেছে যাও।”

৭। “কুনজাসকের (চতুই পাখী) মত নিজ হুজরায় বসে আল্লাহর নাম জপ কর।”

৮। “কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর।”

৯। “আইয়ামে বীজের রোজা রাখো।”

১০। “সালাতুত তসবীহ ও তাহাজ্জুদ নামায পড়।”

১১। “আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও। আমার ছেলেরা সব সময় রোজা রাখে।”

ইনতিকাল

তিনি ৭৯ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল ১৩১৩ বাংলা সনের ১০ই মাঘ সোমবার দিবাগত রাতে এক নিরুদম মুহূর্তে রাত ১টায়। তখন ইংরেজি ১৯০৬ সাল। ১৩২৩ হিজরির ২৭ জিলকদ। প্রতি বছর ১০ই মাঘ মহা সমারোহে তাঁর উরশ শরীফ উদযাপিত হয়। সেদিন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে যে জন সমাগম হয় তাকে জনসমুদ্র বললেও কম বলা হয়।

হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)

হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) মাইজভাণ্ডার শরীফে প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির একটা আলোর মশাল জ্বলিয়েছিলেন, সে আলো থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আরো অনেক আলোর মশাল।

কবি বলেছেনঃ

একটি আলোর কণা থেকে লক্ষ আলো জ্বলে

একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ্ব জগত টলে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) অনেক মানুষের অন্তরে জ্বলিয়ে ছিলেন আলোর শিখা। এঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম আলোর শিখা হচ্ছেন হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। দীর্ঘদিন ধরে বহুজনের মুখে ও লিখায় তাঁর নাম সৈয়দ গোলামুর রহমান কপেও চালু হয়ে গেছে। জনসাধারণের কাছে তিনি ‘বাবা ভাণ্ডারী’ নামে সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচারিত। তাঁর সম্মানজনক পদবী হচ্ছে, গাউসুল আযম বিল বিরাসত। সম্পর্কে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ছিলেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর আপন ভতিজা। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর আরো দু’ভাই ছিলেন। একজন হচ্ছেন শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ আল-হাসানী আল মাইজভাণ্ডারী। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম আল-হাসানী আল মাইজভাণ্ডারী। ইনিই হচ্ছেন হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) এর সৌভাগ্যবান পিতা। হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) এর মায়ের নাম ছিল: সৈয়দা মোশাররফ জান বিবি। তাঁরই পবিত্র গর্ভে ১২৮৪ হিজরির ১২ রবিউস সানী, বাংলা ১২৭০ সনের ২৭ আশ্বিন সোমবার সকালে বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) এর জন্মের পর মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশি ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে খুশির ঢেউ বয়ে যায়। এমন সুন্দর শিশু সচরাচর দেখা যায় না। এমন ফুটফুটে, পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল-রেন বাগানের সদ্য ফোটা

গোলাপ ফুল। এটি কি কুরআনে বর্ণিত গোলমানের প্রতিরূপ! যে দেখে সে মুগ্ধ। যে দেখে মনের অজান্তে তাঁর মনে জেগে ওঠে অপূর্ব এক ভাব। এ তো সাধারণ শিশু নয়। নিশ্চয়ই বড় হয়ে এ শিশু কোন এক মহাপুরুষে পরিণত হবে।

পরিবারের সবার মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু এ শিশু। মা বাবার চোখের মনি। শিশুর কল্যাণেই বুঝি জায়-জোয়ারে ভরে ওঠল পুরো পরিবার। অজানিতে মা বাবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্তরের ভাষা। আলহামদুলিল্লাহ! এত সব প্রশংসা তোমার। যথাসময়ে মুড়িয়ে ফেলা হল শিশুর গাছ-তুল। উৎসবের সাথে দেয়া হল গোসল। পরানো হল পিরকার কাপড়, নেয়া হল শিশুর বড় চাচা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সমীপে। দেখামাত্র তিনি তাঁকে তুলে নিলেন কোলে। তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে বের হল: “এ শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর চেহারা তার মধ্যে এসেছে, একে খুব যত্ন করো।”

এতদিন এ শিশু সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজনের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তাই ভাষা পেল আল্লাহর মহান অলির জ্বানে। যখন তাঁর কাছে এ শিশুর একটি নাম দেয়ার আবেদন জানানো হল, তখন তিনি তাঁর নাম দিলেন, গোলাম রহমান। সবার কাছে এ নাম জানিয়ে দেয়া হল। এ নামেই দেয়া হল আকিকা। পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হল উৎসব। আয়োজিত হল খাওয়া দাওয়া। আন্তে আন্তে শিশুটি বড় হতে থাকল। হাঁটি হাঁটি পা পা করে দু’বছর পূর্ণ হল শিশুর। আধা আধা বোল তাঁর। এ বোল মধু বর্ষণ করে সবার কানে। শিশুটি হযরত সাহেব কেবলার খুবই প্রিয়। শিশুটিও কী এক আকর্ষণে বারবার তাঁর কাছেই ছুটে আসে। তিনি তাকে নিজ হাতে খাইয়ে দেন নানা ফল মিষ্টি ও শিশুতোষ খাবার।

সময় গড়িয়ে চলে, সময় আসে শিশুটির হাতে খড়ির। তাদের বাড়ির উঠানেই ছিল এক ফোরকানিয়া মাদরাসা। সে মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন এক বুজুর্গ ব্যক্তি। শিশুটি সম্পর্কে ছিল তাঁর খুবই উচ্চ ধারণা। তিনি শিশুর পিতাকে তাঁর মনের কথা জানান। কালক্রমে

শিশুটি একজন মহাপুরুষে পরিণত হবে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তাঁর ধ্যান। শিক্ষকের কথা শুনে ধূশিতে ভরে যায় মা বাবার মন। আল্লাহর দরবারে তোলেন প্রার্থনার হাত। শুভ দিনে ছেলেকে নিয়ে বাবা হাজির হন বড় ভাই হযরত সাহেব কেবলা (কঃ) এর কাছে। ছেলের পরনে তখন নতুন শিক্ষার্থীর পোশাক। তাকে এ বেশে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন: “তুমি কালামুল্লাহ পড়বে? আচ্ছা পড় দেখি।” তিনি কুরআন শরীফের কিছু আয়াত পড়লেন। অতঃপর মিলাদ পড়ে মুনাজাত করলেন। তোমরা জান, দোয়া ইবাদতের সার। আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে তাই বলেছেন। আল্লাহর বন্ধুরা আল্লাহর দরবারে হাত তুলতে কখনো ভুল করেন না।

এরপর শিশু বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ভর্তি হন উক্ত মাদরাসায়। তোমরা জান মুসলমান নর নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। এটা হাদিসের বাণী। তাই হাদিসের পথ ধরেই প্রত্যেক শিশুকে জীবনের পথ চলা শুরু করতে হয়। আজকাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখার চাপে সংসারের কোন কাজ করার সুযোগ পায় না। কিন্তু তৎকালে পড়াশোনা করেও ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মা বাবাকে কাজে কর্মে সাহায্য করত। আমাদের বাবা ভাণ্ডারীও ছোট বেলায় মাঠে কাজ করতেন। তিনি মাঠে গরু চরাতে। তখন আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটত। তিনি গরুকে বলতেন, ‘দেখ, ফসল নষ্ট করিস না।’ গরু কি মানুষের ভাষা বুঝতে পারে? সত্যিই গরুরা মাঠের ঘাস খেত, কিন্তু কখনো ফসল নষ্ট করত না। যেন তারা বাবা ভাণ্ডারীর একান্ত অনুগত।

ফোরকানীয়া মাদরাসার পড়া শেষ হলে তিনি চট্টগ্রাম সরকারি মোহসেনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি ছিলেন লেখাপড়ায় সেরা। আবার নামায কালামেও পাকা। তখন তিনি জায়গীর থাকতেন। নিজের ও ছাত্রদের পড়া শেষ হলে তিনি পাশের বহরদার হাট মসজিদে চলে যেতেন। রাতভর তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। সেখানে উপস্থিত হতেন সাদা কাপড় পরিহিত কিছু অচেনা মানুষ। তাঁরা জামাতে নামায পড়তেন। তিনি হতেন নামাযের ইমাম।

সংসার জীবন

২৩ বছর বয়সে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) বিয়ে করেন। পাত্রী সৈয়দা মোছাম্মৎ জেবুন্নেছা বেগম। বাড়ি সুয়াবিল। তিনি ছিলেন শাহ কমর চান্দ (রঃ) এর বংশধর। তাঁর বাবার নাম ছিল সৈয়দ আশরাফ আলী আল হাসানী।

বিয়ের দু'বছর পর তিনি ছিলেন জামায়াতে উলার ফাইনাল পরীক্ষার্থী। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। তিনি পরীক্ষার জন্য হযরত সাহেব কেবলার অনুমতি নিতে যান। কিন্তু তিনি কথা বলার কোন সুযোগ পান না। এরপর পরীক্ষার সময় কাছাকাছি হলে তিনি হযরত সাহেব কেবলার নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি ছিলেন কাটাখালী নামক একটি খালের পাড়ে সরিয়া ক্ষেতের ধারে। বাবা ভাণ্ডারী সেখানে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন হযরত সাহেব কেবলা জজবা হালতে অনেক কথা বলেন। তা কারো বুঝার সাধ্য নেই। এরপর একটু স্বাভাবিক হয়ে বলেন, “তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে বাবা, আমি তোমাকে নাজিরহাটের আশরাফ আলী খলিফার দোকানে খেয়ে মসজিদে থাকতে বলি।” এরপর পরীক্ষা দেয়ার বিষয়ে আবার বলা হলে তিনি তাঁর হুজুরার তাকের উপর থেকে পীরানে পীরের হরিণী জোষাটি নিয়ে আসতে বলেন। তা নিয়ে আসা হলে তিনি প্রথমে নিজে তা প করেন। পরে তা খুলে বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) কে পরিবেশ দেন। এতে অনেক আধ্যাত্মিক গোপন রহস্য ছিল।

এ ঘটনার পর বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) উলা পরীক্ষা দিতে যান। কিন্তু দু'দিন পরীক্ষা দেয়ার পর তাঁর মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে যায়। তিনি গজল গাইতে থাকেন। মাঝে মাঝে বলতে থাকেন, আপনি কেন কষ্ট করে এখানে এসেছেন? আপনি চাইলে আমি মাথায় ভর দিয়ে আপনার কাছে হাজির হতাম। তখন মানুষ তাঁর এসব কথার মানে বুঝতে পারেনি।

এরপর তাঁকে হযরত কেবলার কাছে নিয়ে আসা হয়। এক রহস্যময় অবস্থায় গুরু ও শিষ্যের সাক্ষাত লাভ ঘটে। এ সাক্ষাতে বাবাভাণ্ডারী

(কঃ) মানসিক ও আত্মিক শান্তি লাভ করেন।
এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। বাবা ভাঙ্গারীর (কঃ) আগেও হয়রত গাউসুল আযম মাইজভাঙ্গারী তথা হয়রত সাহেব কেবলার (কঃ) অনেক খলিফা, ভক্ত, অনুরক্ত ও কামেল যুরীদ ছিলেন।

আধ্যাত্মিক ভ্রমণ

এরপর থেকে হয়রত বাবা ভাঙ্গারী (কঃ) আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে সফর শুরু করেন। পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে তিনি আল্লাহর সাধনা করতে থাকেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বর্তমানের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানসহ দেয়াং এর পাহাড়, উত্তর পাহাড় ও সীতাকুণ্ড পাহাড়ে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান।

সিঁহাসনে আরোহণ

কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি মারিফাতের উচ্চ দরজা লাভ করেন। পরিবার পরিজনদের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন একেবারে নির্লিপ্ত। শত শত ভক্ত মানুষ প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে ভীড় জমাত, তাঁর দেয়া চাইত। মানুষের এত ভিড় হত যে, তাদের সামলানো কঠিন ছিল। এ জন্য আল্লাদা লোক মোতায়েন করতে হত। জীবনের শেষ ২৩ বছর তিনি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যান। বিছানায় আপদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন। লোকজন তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য তাঁর কাছে আরজি পেশ করতেন। খাদেমগণ তাঁর হাতে পানি ঢালতেন। তিনি হঠাৎ করে কাউকে পানি ছিটিয়ে দিতেন। এতে লোকজনের ইচ্ছা পূরণ হোত। নীরব অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তাঁর আশেপাশে ভক্ত ও মুরিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

তাঁর আওলাদে পাক

- ১। শাহজাদী সৈয়দা মায়মুনা খাতুন (রঃ)
- ২। শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন (রঃ)

- ৩। শাহজাদা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ খায়রুল বশর আল হাসানী আল মাইজভাঙ্গারী (কঃ)
- ৪। শাহজাদা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ মাহবুবুল বশর আল হাসানী আল মাইজভাঙ্গারী (কঃ)
- ৫। শাহজাদা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আবুল বশর আল হাসানী আল মাইজভাঙ্গারী (কঃ)
- ৬। শাহজাদা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ শফিউল বশর আল হাসানী আল মাইজভাঙ্গারী (কঃ)

তাঁর খলিফাগণঃ

যাঁরা হয়রত সাহেব কেবলা (কঃ)র মত হয়রত বাবা ভাঙ্গারী (রঃ)রও অনেক খলিফা আছেন। তাঁরা তাঁর সাহচর্যে এসে পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করেছেন। তাঁরাও ছিলেন মানবতার খাদেম। আল্লাহ প্রেমিক ও রাসূল সান্নাধ্যাঙ্ক আলয়াহি ওয়াসাল্লাম এর আশেক। তাঁদের এক নামে পরিচিতি ছিল তাঁরা সবাই মাইজভাঙ্গারী ঘরানার আউলিয়ায়ে কেবাম। তাঁরা সবাই ছিলেন উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।

আশাকরি ভবিষ্যতে তোমরা তাঁদের জীবন ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

কারামত

- হয়রত বাবা ভাঙ্গারী (রঃ)র কারামতের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর কারামত অসংখ্য।
১. তিনি গভীর রাতে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় সময় কিছু অপরিচিত লোকের সাথে মিলিত হতেন। তাঁদের পরনে থাকত সাাদা পোশাক।
 ২. বিযাক্ত মাকল ফলকে তিনি সুমিষ্ট ফলে পরিণত করেছেন।
 ৩. তাঁকে দেখে হিংস্র রাম কুকুরের দল পালিয়ে গিয়েছিল।
 ৪. তাঁকে বনের মধ্যে এক হিংস্র বাঘ সালাম জানিয়েছিল।

৫. তিনি এক মৃত ঋমিয়াকে জীবিত করেছিলেন।

৬. আসগর শাহ নামী এক ফকিরকে গ্রহণ করে তিনি সাগরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৭. তিনি একবার রেল লাইনের উপর বসা ছিলেন। তখন আসাম মেইল ট্রেন আসছিল। ট্রেনটি হঠাৎ সামনের দিকে চলার পরিবর্তে পোছন দিকে চলতে আরম্ভ করেছিল।

৮. তিনি গাছের পাতার রস গরম করে আমার পয়সাকে সোণায় পরিণত করেছিলেন।

৯. বিশালাকার একটি সাপ ফনা বিস্তার করে তাঁকে ছায়া দিয়েছিল।

১০. তিনি আরেকবার রেল লাইনের উপর বসে অগ্রগামী রেলকে ধামিয়ে দিয়েছিলেন। পরে দেখা গেল, কিছু দূরে রেল লাইনের উপর গাছের ব্যারিকেড দেয়া রয়েছে।

১১. একই সময়ে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে দেখা যেত।

এরকম অজস্র ঘটনা তাঁর আশ্চর্য কারামতের সাক্ষ্য বহন করে যা নিঃসন্দেহে হযরত বাবা ভাঞ্জরী (কঃ)-এর মত একজন মহান আলির পক্ষেই কেবল সম্ভবপর ছিল।

ইনতিকাল

তিনি ২২ চৈত্র, ১৩৪৩ বাংলা, ৫ এপ্রিল, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ, ২২ মহররম, ১৩৪৬ হিজরি, সোমবার সকাল ৭:৫৫ মিনিটে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর ৬ মাস।

হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাঞ্জরী (কঃ)

তোমরা আগেই জেনেছ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (কঃ) এর দুই ভাই ছিলেন। তাঁর মোজ ভাইয়ের নাম ছিল শাহসুফি সৈয়দ আবদুল হামিদ। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ছোট জনের নাম হল সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (কঃ)। বুঝতেই পারছ সম্পর্কে ইনিও হযরত সাহেব কেবলার ভতিজা। অনেকের কাছে তিনি 'ছোট মাওলানা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

শিক্ষা

তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে মাদরাসা শিক্ষা শেষ করেন। এরপর চট্টগ্রাম মোহসেনিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। তখন পরীক্ষা হত কলকাতা মাদরাসা বোর্ডের অধীনে। পরীক্ষায় তাঁর ফলাফল ছিল খুবই ভাল।

আধ্যাত্মিক জীবন

কথায় বলে সংসঙ্গে স্বর্গবাস। ভালো মানুষের সাথে চলাফেরা করতে করতে সাধারণ মানুষও ভালো হয়ে যায়। হযরত কেবলার কাছাকাছি থাকতে থাকতে মানুষ জলের আচার আচরণ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতে থাকে। হযরত আমিনুল হক ওয়াসেল সব সময় হযরত কেবলার সাথে থাকতেন। তিনি মনে প্রাণে তাঁর খেদমত করতেন। খেদমতেই বরকত। তাই হযরত কেবলা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'আমার আমিন মিয়া।' আল্লাহর অলিগণ কখনো অন্য বসে থাকেন না। তাঁরা সব সময় হয় আল্লাহর কাজ করেন, না হয় মানুষের জন্য কাজ করেন। হযরত সাহেব কেবলার সকল কাজে 'আমিন মিয়া' ছিলেন তাঁর সহযোগী। তিনি তাঁর সকল কাজ কর্মকে বলতেন, 'আমিন মিয়ার দফতর।'

তাই তিনি পরিচিত হন ‘দফতরে গাউসুল আযম’ রূপে। প্রতিদিন মাগরীর নামাযের পর তিনি হযরত কেবলা থেকে ফয়েজ লাভ করার জন্য ভক্তিমূলক গান করতেন। এ গানগুলো ছিল আদলে রুহানী সংগীত। এতে রূহ তাজা হত। আল্লাহর প্রতি মহস্বত সৃষ্টি হত। এ সংগীতের সুরে মানুষ মোহিত হয়ে যেত। হযরত কেবলার অনুমোদনক্রমে তাঁর অনুসারী ও ভক্তগণ এ আসরে যোগ দিতেন। এভাবে মাইজভাণ্ডারী তুরিকায় ‘সেমা’ মাহফিলের সংযোগ ঘটে।

এ মাহফিলে যোগদানের সুবাদে মাইজভাণ্ডারী আদব কায়দা ও নিয়মনীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। মানুষের আচার আচরণে ভক্তি, শৃংখলা ও সংযত ভাব সৃষ্টি হয়।

সংসার

তাঁর সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। হযরত কেবলার একজন খলিফার নাম ছিল কাজী আসদ আলী (রঃ)। তাঁর কন্যাকে তিনি হযরত সৈয়দ আমিনুল হক (কঃ) এর সাথে বিয়ে দেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

ইনতিকাল

১৯০৬ সালের ৯ অথবা ১১ ডিসেম্বর তিনি ইনতিকাল করেন। একটি সূত্র মতে হযরত কেবলা (কঃ) এর ইনতিকালের ৪০ দিন পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাঁকে বলা হয় কুতুবুল এরশাদ। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর রওজা শরীফ বেইটনীর ভেতরেই তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।

হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

জন্ম ও পরিচয়

তাকে অছিয়ে গাউসুল আযম বলে সবাই চিনে। তিনি ছিলেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর নাতি। তাঁর জন্ম তারিখ ১৮৯৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১২৯৯ বাংলা সনের ১৩ ফাল্গুন। তাঁর মহান পিতার নাম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী। হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ রহিমউল্লাহ মিজাপুরী ছিলেন তাঁর নানা। তিনিও ছিলেন আল্লাহর এক মহান অলি।

শৈশবেই তিনি বাবাকে হারান। তিনি দাদা-দাদীর কাছে লালিত পালিত হন। দাদা হযরত সাহেব কেবলা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দিতেন না। একবার তাঁকে না জানিয়ে শিশু দেলাওর মামা বাড়ি গিয়েছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত দাদা জান কোন খাবারই গ্রহণ করেন নি। এরপর থেকে দাদাজানের জীবনকালে তিনি কোথাও যেতেন না। হযরত কেবলা (কঃ) তাঁকে আদর করে ডাকতেন, ‘দেলা ময়না’, ‘দাদা ময়না’ ইত্যাদি।

ছাত্রজীবন

মাত্র ৫ বছর বয়সে দাদাজান হযরত কেবলার কাছেই তাঁর প্রথম লেখাপড়া শুরু হয়। পাশের গ্রাম বাবুনগর নিবাসী মাওলানা অলিউল্লাহ সাহেব ছিলেন তাঁর প্রথম গৃহ শিক্ষক। মিজাপুরের মাওলানা হাফেজ করী তফাজ্জল হোসাইন হন তাঁর পরবর্তী গৃহ শিক্ষক। তাঁর কাছে তিনি আরবি, ফার্সি ও উর্দুভাষার প্রয়োজনীয় কিতাবগুলো পড়েন। পাঠ্য বইয়ের বাইরেও তিনি নানা রকমের ইসলামী বই পুস্তক পাঠ করেন। তিনি কুরআন হাদিস, ফেকাহ ও দর্শন ইত্যাদিও ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি বাংলা পত্র পত্রিকা পাঠেও আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু

তামরা শুনলে আশ্চর্য হবে তিনি তাঁর শিক্ষকের কাছে মাত্র ১৭ দিন বাংলা পড়েছিলেন। আর এ ১৭ দিন বাংলা পড়েই পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় ১০ টিরও বেশি বই লিখেছিলেন। বইগুলো ছিল জ্ঞানগর্ভে ধ্যায় ভরপুর। মাইজভাণ্ডারী তুরিকার মূলকথা এই বইগুলোতে পাওয়া যায়। এজন্য তাঁকে মাইজভাণ্ডারী তুরিকার স্বরূপ উন্মোচক লা হয়।

মাইজভাণ্ডারী তুরিকা

মাজকের দিনে মাইজভাণ্ডার শরীফ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। বিশ্বের ও দেশের জ্ঞানী গুণীরা মাইজভাণ্ডার সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। সাধারণ মানুষরাও এ দরবার সম্পর্কে বেশ গুয়াকিবহাল। এ সব কিছুর মূলে যাঁর একক অবদান তাঁর নাম হযরত সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন। তিনি বিভিন্ন বই পত্র লিখে মাইজভাণ্ডারী তুরিকা, দর্শন ও এর আদর্শ উদ্দেশ্য সব জানিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষিত মানুষের মাঝে মাইজভাণ্ডারী তুরিকার প্রচার ও প্রসার তাঁর লেখনির মাধ্যমে ঘটেছে।

এ বিষয়ে তাঁর লিখিত অনেকগুলো বই আছে। বড় হলে তোমরা আশাকরি এ বইগুলো পড়বে। তখন তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে। আরো ভালোভাবে, আরো বিস্তারিতভাবে। তাঁর একটি বইয়ের নাম “বেলায়তে মোতলাকা”। মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে যদি ‘নোবেল’ প্রাইজ দেয়ার রীতি চালু থাকত তাহলে এ বইটি ‘নোবেল’ পুরস্কার পেত। এখন তোমরা তাঁর অন্যান্য বইগুলোর নাম জেনে রাখ। নাম শুনে তোমরা বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারবে।

- ১। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত
- ২। মূলতত্ত্ব বা তাজকীয়ায়ে মোখতাছর
- ৩। মানব সভ্যতা
- ৪। বিশ্ব মানবতায় বেলায়তেব স্বরূপ
- ৫। এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক

- ৬। মিলাদে নববী
- ৭। তাওয়াফ্লাদে গাউসিয়া।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। বিলাসিতা বলতে কী জিনিষ তা তিনি জানতেন না। তিনি ছিলেন গভীরভাবে খোদা প্রেমিক। নিয়মিত নামায কালাম রোজা পালন ছাড়াও তিনি গভীর রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন ও জিকিরে মশগুল থাকতেন। মানব কল্যাণ সাধন করা তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। সব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে চলতেন। তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী। তিনি নিজের পরিচয় দিতেন ‘খাদেমুল ফোকরা’। অর্থাৎ ফকিরদের সেবক।

জনকল্যাণ

মানুষের উপকার করে তিনি আনন্দ পেতেন। তিনি মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষ যাতে মাইজভাণ্ডারী তুরিকা বুঝতে ও অনুসরণ করতে পারে তজন্য পুস্তক রচনা ছাড়াও সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাঁর গড়া সংগঠনের নাম: ‘আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী’। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন ক্ষুধার্ত দুঃস্থ অসহায় মানুষের জন্য তিনি ‘কিচেন কমিটি’ গঠন করেছিলেন। তাঁর আর্থিক সাহায্যের ফলে অনেক অসহায় মানুষ লালিত পালিত হয়েছে। অনেক গরীব ছেলোমেয়ে লেখাপড়া শিখতে পেরেছে। দেশ বিদেশ সফর না করলে মানুষের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় না। তিনি অনেক দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি বার্মা (বর্তমান মায়ানমার), এবং ভারতের কোলকাতা, পন্ডিচেরি, দিল্লি, আগ্রা, আজমীর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি বলে গেছেন তাঁর কবরের উপর যেন কোন সৌধ নির্মাণ করা না হয়। তিনি দুনিয়ায় একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন, মৃত্যুর পরও সাধারণ থাকতে চেয়েছেন। অথচ তিনি ছিলেন অসাধারণ মানুষদের মাঝে একজন।

হয়রত অস্থিরে গাউসুল আযম (রা.)এর কতিপয় বাণী:

১. “বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির স্থায়ী সমাধানের জন্য এবং ধান উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার বিকল্প নেই।”
২. “আগে নিজের পরিবার, ঘর-সংসার ও পেশাগত দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হও। তারপর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সময় দাও যদি তা সম্ভবপর হয়।”
৩. “পরিচ্ছন্নতা খোদায়ী গুণ। তুমি যদি কাজে-কর্মে, দেহে-প্রাণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, মন-মানসিকতায়, আচার-ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন না হও, তাহলে তুমি খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবেনা।”
৪. “সংভাবে হালাল ব্যবসা কর। দুর্নীতির আশ্রয় নিওনা। তেজারত রসুলের সুলত।”
৫. “অহমিকা বড় খারাপ। অহমিকা ও দম্ভ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কর।”
৬. “জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান ছাড়া কোন জাতি জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেনা।”
৭. “তুমি যদি যোগ্য না হয়ে বুজুর্গী কামনা কর, তা তুমি পাবেনা। হয়রত সাহেব (ক.)’র সাথে কেবলমাত্র রক্তের সম্পর্কের কারণে তুমি নিজেকে অলি দাবী করতে পারনা। অলি হতে হলে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।”
৮. “যাঁদের কামালিয়ত নেই তাঁরা মাইজভাণ্ডার শরিফের আগলাদ হলেও তাঁদের কবরের ওপর সৌধ বা রওজা নির্মাণ করা উচিত নয়। এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করবে যেহেতু মানুষ প্রকৃত অলিকে তখন চিহ্নিত করতে পারবেনা।”
৯. “মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের যে কোন আগলাদে পাকের উরস অনুষ্ঠান করা ঠিক নয়। উরস অনুষ্ঠান কেবলমাত্র ওই সকল আগলাদের জন্য নির্ধারিত যারা প্রকৃত অর্থে কামালিয়ত অর্জন করে অলি হয়েছেন। সারা বছরই যদি মাইজভাণ্ডার দরবার

শরিফে কোন না কোন আগলাদের উরস হতে থাকে, তাহলে লোকজনকে তাদের পরিবার এবং ঢাকুরীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কেবল দরবার শরিফে আসা যাওয়াতেই ব্যস্ত থাকতে হবে।”

১০. “সকলকে আমার মুনিব [হয়রত আকদাছ (ক.)] কে সম্মান করতে হবে এবং তাঁর রওজা শরিফ জিয়ারত করতে হবে। যদি তোমরা তা কর, তবে তার অংশ আমি পাব।”

১১. “যদি কেউ মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে, তবে সে হয়রত আকদাছ (ক.)’র আসহাব বা সাথী হিসেবে গণ্য হবে।”

১২. “যদি মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মর্মকথা সারা বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে সারা বিশ্বের নজর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দিকে ফুরে যাবে।”

১৩. “সমাজে আদলে মোতলাক (বিচার সাম্য) প্রতিষ্ঠা কর। কারও প্রতি অবিচার করনা।”

১৪. “ঈমানদার হও। হজ্ব কর, নামায পড়, রোজা রাখ, যাকাত দাও। যেনা করনা, মিথ্যা বলনা, মিথ্যা সকল অন্যায়ের মা-বাপ”।

১৫. “বিপদে আপদে, সকল সময়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস হারাইওনা। আল্লাহ সকল সময়ে তোমাকে সাহায্য করবেন।”

১৬. “আমি ছায়ার পীরি ব্যবসা করিনা। পাক-সাফ হওয়ার জন্য মানুষ পুকুরের কাছে যায়। পুকুর মানুষের কাছে যায়না।”

ইনতিকালঃ

তিনি ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮২ সাল, ২ মাঘ ১৩৮৮ বাংলা, ৯০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

জন্ম ও পরিচয়ঃ

তোমরা ‘শাহানশাহ’ হিসেবে তাঁর নাম শুনে থাকবে। মাইজভাণ্ডারী ঘরানার একজন মহান ও মহৎ অলি-এ-কামেল হিসেবে তিনি দশ দিগন্ত কাঁপিয়ে গেছেন।

তিনি ১২ রজব, ১৩৪৭ হিজরি, ১০ পৌষ, ১৩৩৫ বাংলা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত সাহেব কেবলার পৌত্র হযরত সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (কঃ) এর ১ম পুত্র। তাঁর দাদাজানের নাম সৈয়দ ফয়জুল হক (কঃ) ও নানাজানের নাম হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। তাঁর কথা তোমরা এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জানতে পেরেছো। তোমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ তিনি কেমন বুজুর্গ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কেমন বুজুর্গ ব্যক্তিদের রক্ত তাঁর শরীরে বইছে।

শিক্ষা

হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে কানুনগো পাড়া কলেজে ভর্তি হন। শিক্ষা জীবনের মাঝপথেই তাঁর জীবন স্রোত উল্টে যায়। তিনি তখন বি এ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পরীক্ষার তৃতীয় দিনে সাদা খাতা জমা দিয়ে তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে ফিরে আসেন। এ ফিরে আসা আসলে ছিল তাঁর বিশ্বযাত্রার সূচনা। এ বিশ্বযাত্রা শুরু হয়েছিল জীবন রহস্যের সূড়ঙ্গ পথে। পরিশেষে তিনি পরিণত হন বিশ্ব-অলিতে। তোমরা যথাযথই শুনেছ, তাঁকে বলা হয় বিশ্বঅলি শাহানশাহ।

আধ্যাত্মিক জীবন

সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনের বাইরে তাঁর জীবন ধারা প্রবাহিত হয়েছিল ভিন্নতর পথে। তাঁর আচার আচরণ কথাবার্তা, কাজকর্ম সব ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। সাধারণ মানুষ ব্যতিক্রম পছন্দ করেনা। প্রথম দিকে তাই তাঁর আচরণের রহস্য বুঝতে পারেনি অনেকেই। মানুষ প্রচণ্ড গরমে ছায়ার আড়াল খোঁজে, কিন্তু গ্রীষ্মের খর দুপুরে সকল ছায়ার আড়ালকে ছিন্ন করে সূর্যের দিকেই তিনি তাকিয়ে থাকতেন। মানুষ শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য গরম লেপের নীচে আশ্রয় নেয় অথচ তিনি কনকনে ঠান্ডায় একঠায় ভূরে থাকতেন পানির ভেতরে। দূরগামী মানুষ গাড়ি ছাড়া পথ চলেনা, কিন্তু তিনি হাঁটতেন মাইলের পর মাইল শুধু দু’পায়ে কুদরতের প্রলেপে।

৪০ বছর বয়সে তাঁর মহান পিতা মর্নিদে কামিল হযরত সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) থেকে তিনি খিলাফত লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি আর পেছনে ফিরে তাকাননি। তিনি অগ্রসর হয়েছেন কুদরতের দিকে। তিনি হয়েছেন আল্লাহর জন্য দেওয়ানা। হয়েছেন ফানাকিগ্লাহ, আল্লাহর জন্য ফানা।

তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য

তিনি ছিলেন উদার ও কোমল মনের অধিকারী। পরিবারের বড় সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁর কথায় ও কাজে, আচার ও আচরণে সবসময় বড় মনের পরিচয় ফুটে উঠত। কিন্তু তাঁর কোন বড়ই ছিলনা। শুরু থেকেই তাঁর ছোট ভাইদের যে কোন আঙ্গুর মিটাতে তিনি কখনো পেছপা হননি। বড় হয়েও ছোট ভাইদের সাথে তিনি ভদ্র ও নরম ব্যবহার করতেন। এমন স্নেহশীল বড়ভাই ছিল অনেক সংসারে বিরল। পরিবারের ক্ষেত্রে এ উদারতা পরবর্তীতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য অব্যাহত হয়েছিল। গরিব, দুঃখী, অসহায়, দুস্থ মানুষের জন্য ছিল তাঁর বুকভরা ভালোবাসা। মানুষের চোখের পানি দেখে তাঁর মন বিগলিত হয়ে পড়ত। আল্লাহকে ভালোবাসতে গিয়ে তিনি আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবেসেছেন। গৃহপালিত ও বনের পশুপাখির জন্যও ছিল তাঁর সমান দরদ।

প্রিয় শিশু কিশোর বন্ধুরা, তোমরা যে বইটি ধৈর্য ধরে পড়ছ সে জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। পড়া একটি ভালো অভ্যাস। ধৈর্য ধারণ করাও একটি ভালো কাজ। ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন। এর অর্থ তোমরা যখন ধৈর্য ধরবে তখন আল্লাহও তোমাদের সাথে থাকবেন। এবার তোমরা ছবি দেখ। যে মহান আল্লিদের কথা তোমরা এ বইতে পড়ছ তোমরা তাঁদের বিশ্বামহলগুলো (মাযার) ছবিতে দেখতে পাবে। এ ছবিগুলো দেখার সময় তোমরা মনে মনে দরুদ শরীফ পড়বে। দেখবে তোমাদের মধ্যে অন্য ধরনের এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।

আচ্ছা তোমরা কি মাইজভাণ্ডারী হতে চাও?

তাহলে তোমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে।

১। প্রথমেই তোমাদের ভালোভাবে লেখাপড়া করতে হবে, দেখেছোতো, মাইজভাণ্ডারী আওলিয়াগণ লেখাপড়ায় কেমন মনোযোগী ছিলেন?

২। কখনো মিথ্যা বলবে না।

৩। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করবে।

৪। নিয়মিত নামায পড়বে, নিজ নিজ ধর্মের মূলনীতি গুলো জেনে নেবে ও মেনে চলতে চেষ্টা করবে।

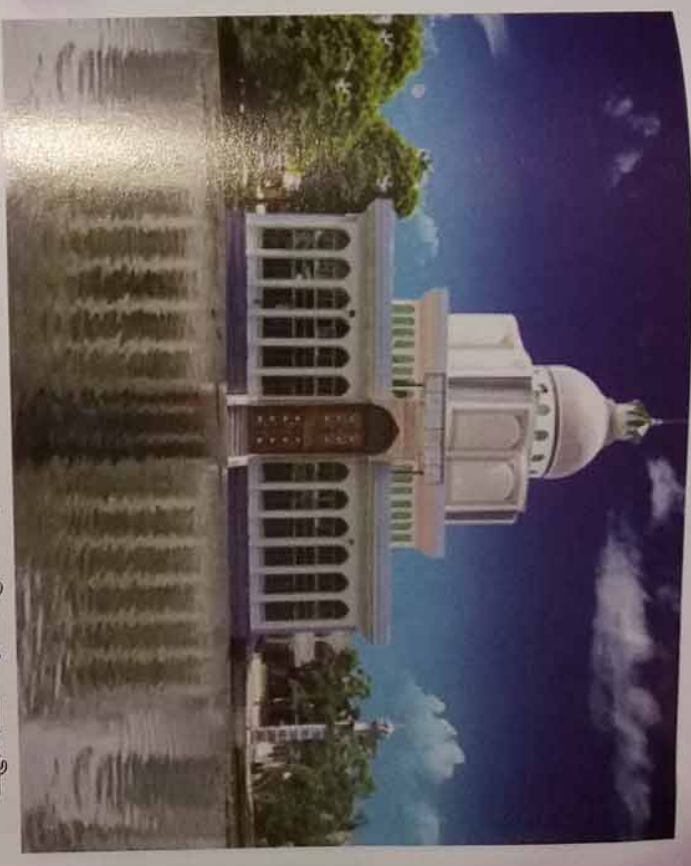
৫। মানুষের মনে কখনো আঘাত দেবে না।

৬। প্রতিবেশিকে ভালবাসবে, তাদের কষ্ট দেবে না।

৭। মনে রাখবে, সব মানুষ এক আল্লাহরই সৃষ্টি।

মাইজভাণ্ডারী হওয়া মানে ভালো মানুষ হওয়া।

ছবিতে মাইজভাণ্ডার শরীফ



গাউসুল আযম হযরত নৈয়াদ আহমাদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ওরজা শরীফ



গাউসুল আযম হযরত নৈয়াদ আহমাদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ওরজা শরীফ এর ভিতরের অংশ

ছোটদের মাইজভাণ্ডার শরীফ-৪১



গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দরগাহ শরীফ



গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ব্যবহৃত ঐতিহাসিক বদনা শরীফ
ছোটদেব মাইজভাণ্ডার শরীফ-৪২



হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র ওরজা শরীফ



হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র ওরজা শরীফ এর ভিতরের অংশ
ছোটদেব মাইজভাণ্ডার শরীফ-৪৩



হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র হুজরা শরীফ



হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র আসন শরীফ
জেটদেব মাইজভাণ্ডার শরীফ-৪৪



হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র রওজা শরীফ
(গোলা চিহ্নিত)



হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র হুজরা শরীফ
জেটদেব মাইজভাণ্ডার শরীফ-৪৫



হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাগরী (ক.)'র রওজা শরীফ
(বাগ-এ হোসাইনী)



হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাগরী (ক.)'র রওজা শরীফ
ছোটদের মাইজভাগর শরীফ-৪৬



হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগরী (ক.)'র রওজা শরীফ



হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগরী (ক.)'র বারহত আসাবর পত্র
ছোটদের মাইজভাগর শরীফ-৪৭



হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ব্যবহৃত ঐতিহাসিক গাড়ি (পানি-স্রোতালিত)



শিঙা-কিশোর সমাবেশ ২০০৯ এ বক্তব্য রাখছেন রাহবুরে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)

ছোটদের মাইজভাণ্ডার শরীফ-৪৮



Alokdhara Books

publication wing of SZHM trust

www.sufimaizbhandari.org